জীবনশিল্পী কাহিনীকার মুজতবা আলী

সঞ্জয় ব্রহ্ম

দেশ বিদেশের সমাজকে দেখা। জীবনকে দেখা। বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিভিন্ন অনুভূতিতে যা কিছু তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, এর প্রায় সবই সৈয়দ মুজতবা আলী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পরিণত বয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও তার রচনা সম্ভার সামগ্রিক ভাবে নেহাৎ কম নয়।

শিক্ষা লাভের জন্য অথবা কর্মসূত্রে তিনি সারা পৃথিবীর একটা বড় অংশ ঘুরেছেন। দেখেছেন। মিশেছেন। জেনেছেন। তার যাত্রা শুরু হয়েছিল শ্রীহট্টের (অধুনা বাঙলা দেশ) প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। চলতে চলতে ইয়োরোপের জার্মানী সহ কয়েকটি দেশ। সুদুর আফগানিস্থান কায়রো ইত্যাদি দেশে তিনি কর্মসূত্রে এবং শিক্ষা লাভের জন্য বসবাস করেছেন। তাদের ভাষা শেখার চেষ্টা করেছেন। সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

গ্রাম্য পাঠশালা থেকে যাত্রা শুরু করে শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষ করে জার্মানের বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। কাজেই তার বৌদ্ধিক বিকাশ ও উত্তরণের যাত্রা পথ ও অভিজ্ঞতা বিশালতর।

এ হেন সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মানুষের লেখনী দিয়ে যা বেরিয়েছে, তা সবই বিচিত্র জীবনের কাহিনী। এ সবের মধ্যেই একটা নিটোল কাহিনী আছে। তা তার রচনা 'দেশে বিদেশে' থেকে শুরু করে উপন্যাস শবনম, শহর ইয়ার, তুলনাহীনা ইত্যাদি। ছোটগল্প নোনাজল, পাদটীকা, বেঁচে থাক সর্দিকাশি, স্মব, কর্নেল ইত্যাদি। আবার পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, দ্বন্দ্বমধুর, ধূপছায়া ইত্যাদি পর্বের রচনাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

এই নিবন্ধে তার কয়েকটি ছোটগল্প এবং বিভিন্ন ধারার কাহিনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা রাখলাম। জীবন শিল্পী সৈয়দ মুজতবা আলী জীবনকে যে রকম দেখেছেন

তার বিভিন্নতা এবং বহু বৈচিত্রময়তা রয়েছে। তার কাহিনীতে পাওয়া যায় দুর্বার প্রেম, বিরহ হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ আবার অদ্ভুত রকমের ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা ও মজলিসী ঢঙে কাহিনীর বর্ণনা।

প্রথমে শুরু করা যাক্ 'নোনাজল' ছোটগল্পটি নিয়ে। গল্পটির পরিনতি অতীব বিষাদপূর্ণ। এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহাজে কর্মরত এক সারেঙ। নাম সমীরুদ্দী। তারই কাহিনী লেখক বর্ণনা করেছেন অন্য এক সারেঙের মুখ দিয়ে। গোয়ালন্দ-চাঁদপাল জাহাজে যাত্রাকালে সেই সারেঙ তার বন্ধু সমীরুদ্দী সারেঙের গল্প শুনিয়েছিলেন। সমীরুদ্দী মার্কিন মুলুকে চাকরী করে, দেশে ভাইকে টাকা পাঠায়। সেই টাকা পাঠিয়ে ভাইকে চিঠিতে জানায় যে পারিবারিক দেনা মিটিয়ে তার নিজের জমির ওপর ভাই যেন একটি বাড়ি তৈরী করে। মনের বাসনা শেষ জীবনে গ্রামে ফিরে সুখে শান্তিতে এবং আরামের সাথে জীবন যাপন করবে। কিন্তু ভাই সেই টাকা নিজে আত্মসাৎ করে এবং দাদার সম্পর্কে দেশ গাঁয়ে নানা অপবাদ ছড়াতে থাকে।

কিছু দিন পর সমীরুদ্দী দেশে ফিরে জানতে পারে তার ভাইয়ের কীর্তিকলাপ। সে আর বাড়ি না ফিরে গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজে চড়ে শহরে ফেরার জন্য। সেই পর্বেই সমীরুদ্দী তার দুঃখের কাহিনী জাহাজের সারেঙকে কথায় কথায় জানিয়ে ছিল। সারেঙ আবার লেখককে শুনিয়েছিল। যাই হোক, সমীরুদ্দী মার্কিন মুলুকে ফিরে যায়। আরো কয়েক বৎসর সেখানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে। সে আবার তার স্বপ্ন পূরণ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ফেরার সময় জাহাজেই তার মৃত্যু হয়। সমীরুদ্দীর আপন বলতে কেউ ছিল না। কাজেই সেই টাকা শেষ পর্যন্ত পেল সেই ছোটভাই।

লেখক কাহিনীর যবনিকা টেনেছেন এই ভাবেই যে, এক দুশ্চরিত্র ভাই তার দাদার সাথে চরম বেইমানী করেও উত্তরাধিকারী সূত্রে সে-ই সমীরুদ্দীর কষ্টার্জিত টাকাগুলো হাতে পেল। আলী সাহেব লিখেছেন, "কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে? সমীরুদ্দী মিরিকিনি (মার্কিন) মুলুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায়নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজেই মারা যায়। ত্রি-সংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছাল সেই ভাইয়ের কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়াল।

'ইনসাফ কোথায়?'

আলী সাহেব গল্পের পরিণতিতে পাঠককে এক কঠিন জিজ্ঞাসার সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়েছেন? গল্পটির মধ্যে সমীরুদ্দীর আকাঙ্খা চিত্রণের সাথে সাথে তার করুণ পরিণতি লেখক অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী করে তুলেছেন পাঠকের কাছে।

আবার 'মণি' গল্পটির শুরুতেই লেখক জানাচ্ছেন যে তিনি কর্মসূত্রে তখন আফগানিস্থানের কাবুলে। সেখানে তিনি মণি নান্নী এক যুবতীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন, মানে মেয়েটিই তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। সে এক প্রগাঢ় প্রেম।— কাহিনীর উপস্থাপনাতে লেখক

গৌরচন্দ্রিকা করেছেন বাল্মিকী থেকে রবীন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র প্রসঙ্গ। রামায়ণের কাহিনীতে লক্ষণের স্ত্রী উর্মিলা উপেক্ষিতা। রাম-সীতা ছাড়া তাদের সখাসখি বা বন্ধুবান্ধবের কথা বাল্মিকী রামায়ণের কোথাও উল্লেখ করেননি। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ উপন্যাস 'গোরা'তেও রবীন্দ্রনাথ বিনয় ও ললিতা দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে হঠাৎ গুম খুন করলেন কেন? তাদের মুখোমুখি আনলেন না কেন?

আদি কবিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলী সাহেব এসেছেন কাহিনীর মধ্যে। তিনি জানাচ্ছেন যে যখন তিনি কাবুলে কর্মরত, তখন তার সাথে পেশওয়ারের পুলিশ ইনস্পেক্টর আহমদ আলীর অগ্রজ শেখ মহবুব আলীর পরিচয় হয়। তিনি তখন ব্রিটিশ লিগেশনে ওরিয়েন্টাল সেক্রেটারী ছিলেন। এই ভদ্রলোকের সাথে লেখকের ঘনিষ্টতা হয়।

সেই শেখ মেহবুব আলীর বাড়িতে লেখক প্রায়ই যেতেন। মেহবুবের একদা বন্ধু এবং পরবর্তীকালে খাস চাকর গফুর। ওদের মধ্যে সখ্যতার সম্পর্ক ছিল। ঠিক চাকর মনিব সম্পর্ক ছিল না। সেই বাড়িতে গিয়ে লেখক আবিষ্কার করলেন এক যুবতীকে । সেই যুবতী সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের। পেশওয়ারের মেয়েদের মতো না। শ্যামাঙ্গী। কিন্তু তার দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনায় লেখক শ্যামাঙ্গীকে অজন্তার চিত্রকলায় অঙ্কিত নারীর দেহ সৌষ্ঠবের সাথে তুলনা করেছেন। মণি আদতে মেহবুব আলীর স্ত্রীর পরিচারিকা কাম্ রাধুনী। সেই মেয়ে প্রেমে পাগল সৈয়দ সাহেবের জন্য। মেহবুব আলী মারফৎ একদিন লেখক এই সত্য জানতে পারলেন।

এর মধ্যেই কাবুল নিরাপদ স্থান নয় বলে লিগেশনের সব মেয়েদের পেশাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেহবুব আলীর স্ত্রী এবং মণিও কাবুল ছেড়ে পেশওয়ারে চলে যায়।

ঘটনাচক্রে লেখক পেশওয়ারে এলে আবার দেখা হয় মণির সাথে। মণি তখন একটাই কথা বলেছিল। 'সালামত'— অর্থাৎ কুশলে আছেন তো?

ব্যাস এই টুকুই। আর ওদের দেখা বা কথাবার্তা হয়নি। কিন্তু ফিরে আসার সময় বাড়ির বাইরে এসে দূর থেকে লেখক লক্ষ্য করেছেন যে মণি অনতিদুরে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আলী সাহেব লিখেছেন, "টাঙ্গাতে উঠে উলটো দিকে মুখ করে বসতেই নজর গেল দোতলার বারান্দার দিকে। দেখি মণি দাঁড়িয়ে। মাথায় ওড়না নেই। আর দু-চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। লম্বা ধারা বয়ে।"

লেখক সম্ভবতঃ তার আফগানিস্থানে থাকার সময়ে বহু বিশিষ্ট চরিত্রের চেয়েও "মণি" অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যদিও সামাজিক মর্যাদার দিক্ দিয়ে সে নিতান্তই গুরুত্বহীন। কাহিনী বর্ণনে আলী সাহেব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার গল্পের মধ্যে গল্প বলা। কাহিনীর মধ্যে অসংখ্য শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটানো। কিন্তু এ সব সত্বেও সবটার মধ্যে একটা নিবিড় যোগসূত্র এবং অসাধারণ পরিবেশনা পাঠককে নিশ্চিতভাবে মুগ্ধ করে। দেশ অথবা বিদেশের সমাজকে এই রকম সুন্দর বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ আলী সাহেবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আবার 'বেঁচে-থাকো সর্দি কাশি' কাহিনীর পটভূমি আবার জার্মান দেশের 'ম্যুনিখ' শহরে। সেখানে একদা লেখক সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঠাণ্ডায় শীতে সে এমন সর্দি লেগেছিল যে নাকের ধারা মুঝতে রুমালের জায়গায় প্রয়োজন হয়েছিল বিছানার চাদর।

ডাক্তার তাকে উপদেশ দিলেন সর্দিতে ওষুধ খেলে সাতদিনে সারে। আর না খেলে এক সপ্তাহে সারে। এই উপদেশ দিয়ে ডাক্তার তার সাথে গল্প জুড়ে দিলেন। ডাক্তার জানাচ্ছেন তিনি তখন সবে ডাক্তারী শুরু করেছেন। একদিন রুগী দেখা সেরে এক বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফেরার পথে স্টেশন রেস্তরাঁয় ঢুকে ব্রাণ্ডি খেতে যান।

সেখানে ঢুকেই এক পরমা সুন্দরীকে দেখেন। সে নারী দেহ সৌষ্ঠব ডাক্তার কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

যেমন "ড্যানিয়ুব নদীর মতো শান্ত প্রশান্ত ভাবখানা তার মুখের ওপর।— তারপর বলেছেন ড্যানিয়ুর নদীর উৎপত্তি স্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ড্যানিয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মতো এঁকে বেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত; ঐ মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকু পাঁকু ভাব।"

আলী সাহেব যে বেশ রসিক তা ডাক্তারের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া তন্বঙ্গীর বর্ণনায় বোঝা যায়। এখানে তার কবি মনের সাক্ষাৎ মেলে। আবার মনে হয় যেন আধুনিক চিত্রকরের তুলি দিয়ে আঁকা নদী এবং নারীর মিশ্রিত এক চিত্ররূপ। সেই অতীব সুন্দরীর সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল ডাক্তার মেয়েটির পিছু নিয়ে তার সাথে একই ট্রেনে ওঠেন। পরে ট্রেনের রেস্তরাঁ বগিতে পাশাপাশি বসবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু হঠাৎ-ই ট্রেনের কাঁচের জানলাটা হাতের বুড়ো আঙ্গুলে পড়ে গিয়ে বিপদ ঘটে। ডাক্তারের আঙ্গুল দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তখন সেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। ডাক্তার ঐ যন্ত্রণার মধ্যেও কেমন অনুভব করেন তা লেখক জানাচ্ছেন, "প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না? বড়ো খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ। আমার হাতে কোনো প্রকার স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয়। তবুও আমার যে কী অবস্থা হয়েছিল। আপনাকে সেটা বোঝাই কী করে? মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল। কারণ একবার চকিতের তরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।"

এর পরে মেয়েটি, নাম— 'এভা'র সাথে দেখা মেডিকেল কলেজের রেস্তরাঁয়। পরে লেখক মেয়েটির পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদির কথা জেনেছেন। পরিশেষে ডাক্তার মেয়েটিকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলেন। তবে সেখানে অর্থাৎ ম্যুনিখের ঠাণ্ডায় ডাক্তারের চরম সর্দিকাশি হয়।— হঠাৎ কাহিনী অন্য দিকে বাঁক নেয়। লেখক জানাচ্ছেন—"আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার ওপর একটু নজর রেখো।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী— হ্যাঁ সুন্দরী বটে। এক লহমায় আমি নর্থ-সী-র ঘন

নীল জল, দক্ষিণ ইতালীর সোনালী রোদে রূপালী প্রজাপতি, ড্যানিয়ুবের শান্ত প্রশান্ত ছবি। সেই ড্যানিয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহছন্দ, রাইন ল্যাণ্ডের শ্যামলিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছুই দেখতে পেলুম।— আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নীচু করে ফরাসী কায়দায় তার চম্পক করাঙ্গুলি প্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম—

"বেঁচে থাকো সর্দিকাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।"

কাজেই প্রেম সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা এবং রসবোধ সহজেই অনুমেয়।

আবার 'গাঁজা' গল্পটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। নিষিদ্ধ গাঁজা পোড়াচ্ছে আবগারী দপ্তর। আর সেই ধোয়ায় সকলের নেশার ঘোরে পড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে একটা মজার কাহিনী বেরিয়ে এসেছে।

আবার 'পঞ্চতন্ত্র'-এ বর্ণিত কাহিনী দাম্পত্য জীবন কাহিনীর মধ্যে মজলিসি গল্পে মেজাজ আছে। দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন বউকে সবাই ডরায়। এ প্রসঙ্গে তিনি এক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। একদিন মহারাজার নির্দেশে প্রজারা একত্রিত হলেন। মহারাজ তাদের কাছে জানতে চাইলেন যে যারা বউকে ভয় পাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও। আর যারা ভয় পাও না তারা নদীর দিকে সরে যাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই হুড়মুড় করে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পাহাড়ের দিকটা ভর্তি হয়ে গেল।

খালি একজন উল্টোদিকে অর্থাৎ নদীর দিকে গেল। তার মানে সে লোকটি বউকে ভয় পায় না। রাজা তাকে পুরস্কৃত করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু মহামন্ত্রী তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যে বড় ও দিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি?'

লোকটি কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, অতশত বুঝিনে হুজুর। এখানে আসার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, "যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।"— তাই আমি ওদিকে যাইনি।" এই মজার কাহিনীর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল যে বউকে সকলেই ভয় পায়।

আবার 'চাচা কাহিনী' পর্বে যে সব কাহিনী বলেছেন সবই তার দেখা জানা চরিত্রসমূহ। আর্লীন উলাল্ড স্ট্রিটের হিন্দুস্থান হৌস নামে রেস্তরাঁয় বসে 'রায়' নামে এক চরিত্র বিয়ার খেতে খেতে গল্পে মশগুল হয়ে ওঠেন। চাচা বলেন, 'মদকে ইংরেজীতে বলে স্পিরিট আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে ভূত সে ভূত কখন কার ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে? তবে ভাগ্যিস ও ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপে ছিল, একবারের তরে।'

গল্পের সন্ধান পেয়ে আড্ডা খুশ। আসর জমিয়ে সবাই বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'— চাচা ওরফে লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে বিচিত্র কাহিনী শুনিয়েছেন। সে কাহিনী

গুলিতে দেশ বিদেশের নানা রীতিনীতি, সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির অনেক খবর পাওয়া যায়। বাঙালী পাঠক সমাজে চাচা কাহিনী টিকে থাকবে তার নিজ বৈশিষ্ট্য গুণে।

আবার ময়ূরকণ্ঠী রচনা সিরিজে 'নেভার রাধা' কাহিনীটি রুশ লেখক তুর্গেনিয়েফকে নিয়ে। কৈশোরে তুর্গনিয়েফ একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি নেভা নদীর তীরে তাদের জমিদারীর চাকর বাকর পরিবৃত বাঙলোতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। একদিন গীর্জায় গিয়ে স্থানীয় এক যুবতী ইভানের প্রেমে পড়েন। ক্রমেই ওদের প্রেম নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর কিছু দিনের মধ্যে তুর্গনিয়েফ সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনি শহরে ফিরবেন। ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল প্যারিস থেকে তোমার জন্য কি আনবো? ইভান অশ্রুসজল চোখে বলেছিল, 'কিচ্ছু না শুধু তুমি ফিরে এসো।— ওগো শুধু তুমি ফিরে এসো।

প্রেমিকার তীব্র আকুতিই গল্পের পরিণতি। দুঃখের বিষয় তুর্গেনিয়েফ এরপর আর কোনো দিন সেই গ্রামে ফিরে যাননি। কাহিনী শেষে একটা বিষাদের সুর বেজে ওঠে।

দেশকাল ও পরিবেশের বৈচিত্রময়তা আলীসাহেবের প্রায় সব রচনাতেই মেলে। প্রখ্যাত সুপণ্ডিত প্রমথনাথ বিশির ভাষায় 'তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কোথাও পণ্ডিতি করেন নি। সেই জন্য সাধারণ পাঠকেরও আকর্ষণ তার রচনায় দিকে'।

কাজেই এই মহান লেখকের শুধু ছোট ছোট কাহিনী নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। এই ক্ষুদ্র লেখায় তার কণামাত্র আলোচনা করা সম্ভব হল।

পরিশেষে আশা রাখি বাঙালী পাঠক সমাজ এই মহান লেখকের জন্মশতবর্ষে তার রচনা পাঠ করে বিশেষ ধারার সাহিত্যরসের আস্বাদন লাভ করুন।